SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং সামাজিক প্রভাব: একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

Gita Rani Mondal
Former Student, Dept. of History
Rabindra Bharati University
Kolkata, West Bengal, India
Email: mondalgita1998@gmail.com

Abstract: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। এই বঙ্গভঙ্গের প্রভাব শুধুমাত্র এক জায়গাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রভাব এক অতীব সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। একে ভারতের প্রথম গণ আন্দোলন বলা যায়। ছাত্র থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধূ সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। রক্ষণশীল নরমপন্থী থেকে শুরু করে চরমপন্থী, বিপ্লবী সন্ত্রাষ ক্রিয়াকলাপ, শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিবাদ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বয়কট সবকিছুরই রাজনৈতিক ধারা এই স্বদেশী আন্দোলন, তা কেবল রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা শিল্পের বিকাশ, বিভিন্ন স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় শিক্ষানীতির মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। একে কেন্দ্র করেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হয়।

Keywords: স্বদেশী, বয়কট, স্বরাজ, চরমপন্থী, নরমপন্থী, সন্ত্রাষবাদ, সাম্প্রদায়িকতা।

ভূমিকা— বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাংলার মানুষ নেয়নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায়— "বাঙালীদের স্পর্শকাতরতায় তাদের গর্ব যে আঘাত পড়েছিল তাতে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হল সকল স্তরের বাঙালী।" বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত এসেছিল। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ভাষায়— এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস পার্টির গোটা বাংলার এবং বাস্তবিক পক্ষে গোটা ভারতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর কেন্দ্র হিসাবে, সকল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার যে আসন রয়েছে তা থেকে তাকে অপসারিত করা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন আরো স্পষ্টবাদী ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর তিনি বলেন, "ঐক্যবদ্ধ বাংলাই শক্তি। বাংলা ভাগ হলে শক্তি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে। কংগ্রেস নেতারাও তাই মনে করেন; তাদের সন্দেহ একেবারে ঠিক আর এটাই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান গুণ।"[1]

রাজনৈতিক দিক থেকেই বঙ্গভঙ্গ ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো এক কৌশল। এই আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক থেকেই প্রভাব ফেলেছিল তাই নয়, বাংলার শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র, শিল্প প্রভৃতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছিল। কাজেই বঙ্গভঙ্গের গুরুত্ব অফুরন্ত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ভাষায় তিনটি পৃথক্ ধারার সূচনা হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনকে মূল কেন্দ্র করে। ধারাগুলি হল—

১)গঠনমূলক স্বদেশী— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জনের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। গঠনমূলক স্বদেশীকে কেন্দ্র করে বাংলার চীনামাটি, দেশলাই, সাবান, কাপড়ের কল প্রভৃতির কারখানা থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় লেখেন— "স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় ইংল্যাণ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না। স্তবস্তুতি অনেক হইয়াছে আর নয়। তখন আইস আমরা নিজের পদভরে দণ্ডায়মান হই।"[2] গঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একদিক হল জাতীয় শিক্ষা। সতীশচন্দ্র মুখার্জী সম্পাদিত 'ডন' (Dawn) পত্রিকায় জাতীয় শিক্ষার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্বদেশীকে কেন্দ্র করে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে ছাত্রদের নিজেদের জাতীয়বাদ চেতনায় সচেতন করা।

এর ফলস্বরূপ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা, নীলরতন সরকারের ব্যবসায়ী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় এইরকম ১০০০টি সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতি আন্দোলন সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল পূর্ববাংলায় বিশেষ করে বাখরগঞ্জের বরিশাল ও ফরিদপুরের মাদারিহাটে, ব্রতী ময়মনসিং এর সুহৃদ ও সাধনা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির খ্যাতি ছিল। স্বদেশী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারায় মৌলিকতা থাকলেও তিনি বয়কটকে বিশেষ একটা সুবিধাবোধ করেননি। যদিও স্বাদেশিকতার ফলে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, সমাজের সকলস্তরের মানুষ এর দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হবে তা জেনেও বয়কটের মধ্যে যে এক জোরজবরদস্তির ভাব তা কবিগুরুকে পীড়িত করেছিল। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন এর দ্বারা হিন্দু মুসলিম ঐক্য হ্রাস পাবে। তাই তিনি বলেন— "বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম আহত নহে গৃহ বিবাদের মত এত বড় আহত আর কিছু নাই।"[3] এইসব কারণে তিনি বয়কটের বিরোধিতা করে লেখেন— "বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে। ইহা দুর্বলের কলহ।...আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দেশে স্বদেশী উদযোগ আজ যে এমন পরিতপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে।"[4]

২)**রাজনৈতিক চরমপন্থী**— দ্বিতীয় ধারাটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামেও পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখেলের মতো নরমপন্থী নেতারা বয়কটকে এক সাময়িক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

বিদেশি পণ্যদ্রব্য বয়কটের মাধ্যমে সস্তায় সমান দামে, দেশীয় কাপড় যোগান দিতে না পারলে এই বয়কট চরম দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিভিন্ন চরমপন্থী নেতা যেমন "লাল বাল পাল" খ্যাত ত্রয়ী থেকে শুরু করে অরবিন্দ ঘোষ বয়কটকে মনে করতেন স্বরাজ লাভের এক প্রয়োজনীয় অস্ত্র। চরমপন্থীদের কাছে স্বদেশী, বয়কট সব কিছু গৌণ স্বরাজ ছিল তাদের মূল কাম্য বা উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের ভাষায়— "বাংলার বয়কট ও স্বদেশি ইতিহাস মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের পরিসীমার সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরে— তার বুর্জোয়া আশা আকাঙ্খা ছিল কিন্তু সত্যিকারের বুর্জোয়া সমর্থন ছিল না।"[5] The history of boycott and Swadeshi in Bengal vividly illustrate the limits an intelligentsia movement with Bradly bourgeois aspirations but without as yet real bourgeois support. বিপিনচন্দ্র তাঁর "New India" পত্রিকায় তুলে ধরলেন এই স্বরাজ তথা বিদেশী শাসনের অবসানের কথা। ১৯০৬ সালে তিনি তাঁর 'New India'য় লেখেন— "Our ideal is full freedom, Which means absence of all foreign control. ১৯০৭ সালের April মাসে অরবিন্দ লিখলেন,— "The new movement is not primarily a protest against bad Government; it is a protest against the continuance of British control." এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতির চারটি ক্ষেত্র ছিল— শিক্ষা, বিচারবিভাগ, পৌরসভা ও আইন এবং অর্থনীতি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা দেয় প্রথম অরবিন্দ ঘোষ আর বিপিনচন্দ্র পাল।

শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। ১৯০৬ সালে বাউড়িয়ার গ্লষ্টার জুট মিলে পরপর তিনটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। বেতন, কাজের সময়, মালিকদের অৎয়াচার প্রভৃতি কারণে শ্রমিকরা কোনঠাসা হয়ে গেছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চরমপন্থী নেতারা শ্রমিকদের তাদের দলে আনার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে যেমন প্রেমতোষ বসু, অপূর্ব কুমার ঘোষ প্রমুখদের নাম উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে যদিও চরমপন্থী নেতা যেমন— বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এগিয়ে আসেনি।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯০৭ সালের চরমপন্থী ও

নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থীদের পতন ঘটায় ও নরমপন্থীদের প্রভাবশালী করে তোলে। যার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অপর্যস্ত (দমন) করার লড়াই অনেকাংশেই ব্যাহত হয়। যার ফলস্বরূপ চারিদিকে হতাশা নেমে আসে এবং প্রথমদিকের উৎসাহ, প্রচেষ্টা, আগ্রহ ধীরে ধীরে নাশ হয়। এই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন কখনই গ্রামাঞ্চলে বা দূরবর্তী অঞ্চল গুলির অশিক্ষিত মানুষদের কোনরকম ভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়াও স্বদেশী আন্দোলন দমন করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। এর ফলস্বরূপ চরমপন্থী নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদী সন্ত্রাসবাদের ক্রিয়াকলাপ চালাতে শুরু করে।

৩)**বিপ্লবী সন্ত্রাষবাদ**— বিদেশী আন্দোলনের অন্যতম তথা শেষ ধারা হল বিপ্লবী সন্ত্রাষবাদ। বিপ্লবী সন্ত্রাষবাদ তথা আদর্শবাদের মূল কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন— জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য আত্মবলিদান, বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের নিজেদের আত্মত্যাগ, এবং সর্বোপরি ইংরেজ বহু শাসকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ও সন্ত্রাষবাদী কার্যকলাপ। বিপ্লবীবাদী সন্ত্রাষবাদের মধ্যে প্রথম অনুশীলন সমিতির কথা উঠে আসে যা ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্র গঠন করেছিল। এর প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে এই বিপ্লববাদী সন্ত্রাষমূলক কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯০৬ সালে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও ভূপেন দত্তের নেতৃত্বে যুগন্তর পত্রিকা প্রকাশ পায়। ১৯০৮ সালের ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মারা যায় কিংসফোর্ডের স্ত্রী ও তার মেয়ে। ১৯০৬ সালে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। এইসময় থেকেই শুধু ভারতে নয় ভারতের বাইরে সন্ত্রাষমূলক কার্যকলাপ ঘটতে থাকে। এই সন্ত্রাষবাদী আন্দোলন ছিল শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আন্দোলন। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

বাংলার বাইরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব—

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, এর প্রভাব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বয়কট ও স্বদেশীর মাধ্যমে এই আন্দোলন যখন স্বরাজ পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছাল তখন এটি সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ পেল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরার পথে মহাত্মা গান্ধী তাঁর হিন্দ স্বরাজে মন্তব্য করলেন যে, স্বদেশীর আদর্শ বাংলা থেকে ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে লণ্ডন থেকে গোপালকৃষ্ণ গোখলে লর্ড মর্লেকে বললেন যে "বঙ্গভঙ্গ আজ একটি রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধও করেন।[6] এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে বিরোধ শুরু হয়। নরমপন্থীদের লক্ষ্য স্বরাজ পাওয়া ছিল না কিন্তু অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পালের মতো চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্যই ছিল স্বরাজের অধিকার।

নরমপন্থীদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি শহর, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে বয়কট স্বরাজ ও স্বদেশের প্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও দক্ষিণ ভারতের মসুলিপত্তম, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি শহরে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। যা বন্দেমাতরম আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯০৮ সালে সুব্রাহ্মনিয়া শিব ও চিদাম্বরম পিল্লাই নামে ২জন নেতা দক্ষিণ ভারতের তুতিকোরিনে বয়কট ও স্বদেশীর বাণী জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। শ্রমিকদেরও তারা নানাভাবে উৎসাহিত করে। শেষমেষ পুলিশের অত্যাচারে ও নানা নিপীড়নের দ্বারা তুতিকোরিনের এই আন্দোলন সন্ত্রাষবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়।

বঙ্গভঙ্গের রেষ বাংলায় ছাপ পড়লেও বাংলারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের কোন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি। উত্তর ভারতের বেশ কিছু

অঞ্চল জম্মু, দিল্লি, কাংড়াতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব—

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতেও আঘাত এনেছিল। যদিও এটা কখনই বলা ঠিক নয় যে হিন্দু ও মুসলিমদের ঐক্যবন্ধন প্রথম থেকেই তীব্রতর ছিল। এই বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব শলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ হিন্দুদের যেমন হতাশ করে সেইরকমই মুসলিমদের খুশি করেছিল। ১৯০৬ সালে ময়মনসিং জেলা, ঈশ্বরগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, বাখরগঞ্জ জেলায় দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল। লাল ইস্তাহার নামক একটি পত্রিকায় জঙ্গী ভাষার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিলে ফল আরও মারাত্মক ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। জন. আর ম্যাকলীন সরকারকেই বেশি দায়ি করেছিল হিন্দু মুসলিম সম্প্রতি নষ্ট হওয়ার জন্য। তাঁর ভাষায়— "যে অনুক্রমিক ঘটনাবলী ১৯০৭ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে সংবিধিগত স্বীকৃতি প্রদানের দাবির ক্রম দিয়েছিল, সে ঘটনাবলীতে ব্রিটিশ ভূমিকা ছিল মুখ্য। ১৯০৫-৯ কালপর্বে বহু ক্ষেত্রেই সরকারী নীতির মূল সুদ নিরপেক্ষ ছিল না। বরং সরকারী কর্মকর্তাগণ বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আগুনকে আরো উস্কে দিয়েছিলেন।"[7]

সাহিত্য সঙ্গিতীতে পত্রপত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের প্রভাব—

সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব চরম শিখরে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান— 'বাংলার মাটি বাংলার জল' রচিত হয়েছিল। রচিত হয়েছিল অতুল প্রসাদ সেনের গান যেমন— 'বলো বলো বলো সবে, শতবিনা বেণু রবে', 'আমরি বাংলা ভাষা', 'সবারে বাসবে ভালো', প্রভৃতি গান। রজনীকান্ত সেনের জনপ্রিয় গান— 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায়ে', 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয় গান— 'বন্দেমাতরম', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জনপ্রিয় গান— 'কোন দেশেতে তরুলতা', দ্বিজেন্দ্রনাথ লাল রায়ের জনপ্রিয় গান— 'বঙ্গ আমার', মহম্মদ ইকবালের জনপ্রিয় গান— 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' প্রভৃতি গানগুলি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র সোরগোল শুরু হয়। যেমন— আনন্দ বাজার পত্রিকা (কলকাতা), চারু মিহির (ময়মনসিংহ), ঢাকা প্রকাশ (ঢাকা), বসুমতি (কলকাতা), জ্যোতি (কলকাতা), বেঙ্গলী (কলকাতা), সঞ্জীবনী (কলকাতা) প্রভৃতি পত্রিকা এই বঙ্গভঙ্গকে নিয়ে মতামত প্রকাশ করে।

নারীদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব— বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রায় সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারী, পুরুষ এবং ছাত্র সকল স্তরের মানুষের যোগদান এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে এক অপরূপ চেহারা দিয়েছিল। ঢাকার আশালতা সেন, বরিশালের মনোরমা বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী অন্তঃপুর নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কন্যা গিরিজা সুন্দরী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠ করে তাঁর মুর্শিদাবাদ গ্রামে ৫০০ এর বেশী নারীকে আন্দোলনমুখী করে তোলেন। ময়মনসিংহের পুষ্পলতা গুপ্ত, কাশীর সুশীলা বসু, জলপাইগুড়ির অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত প্রমুখরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। ফরিদপুরের সৌদামিণি দেবী, বীরভূমের দুকড়িবালা দেবী, বরিশালের সরোজিনী দেবী, ঢাকার ব্রহ্মময়ী সেন প্রভৃতি কম বেশি ভূমিকা দেখা যায়। সেবাসদনের প্রতিষ্ঠাতা এম. জি. রানাডের দ্বিতীয় পত্নী রমাবাই রানাডেও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের প্রভাব শুধু সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষদের মধ্যে সীমাবধ্য ছিল না, তাতে বহু মহিলাদেরও ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

ছাত্রদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব— লর্ড কার্জন্যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনায় বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু স্থানে ছাত্র আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠে। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা এক

জোট হয়েছিল। কোলকাতার রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এর প্রচেষ্টায় ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সভায় যোগদান করে। ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন সেখানে বক্তৃতা দেন। ছাত্র আন্দোলনের আর একটি দিক হল বিদেশী দ্রব্য বয়কট বা বর্জন ও পিকেটিং। ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপ ও গুপ্তসমিতির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দ চন্দ্র রায়, ও উমেশচন্দ্র গুপ্ত, অনাথ বন্ধু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখরা।

উপসংহার— ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শুধুমাত্র সামাজিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতেই বঙ্গভঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, ভারতীয় রাজনৈতিক, সন্ত্রাষবাদী চিন্তাচেতনার ভাবনাতেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলা ভাগের পরই ভারতে সত্যিকারের জনজাগরণ ঘটেছিল। তাঁর ভাষায় "After the partition people saw that petition must be backed up by force and that they must be capable of suffering."[8] এই আন্দোলনই দেখায় যে "আজ বাংলা যা চিন্তা করে, ভারত আগামীকাল তা করবে।"[9]

Endnotes

1. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭", পৃষ্ঠা-৯২।
2. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা- পৃষ্ঠা-৮৭০।
3. সদুপায় সমূহ রচনাবলী ১০ম- পৃষ্ঠা-৫২২।
4. সদুপায় সমূহ রচনাবলী ১০ম- পৃষ্ঠা-৫২২।
5. আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬২১।
6. Collected Works Vol-x, P.-13.
7. বঙ্গবিভাগ (১৯০৫); হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড). পৃষ্ঠা-৩২৫।
8. The Indian National Movement, P.-78.
9. আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ – (১৮৫৮-১৯৪৭) পৃষ্ঠা-৩৮২।

Bibliography

- মল্লিক, সমরকুমার, "আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ", ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১৭-২০১৮।
- বিপিনচন্দ্র, মুখার্জী, মৃদুলা; মুখার্জী আদিত্য, পাণিক্কর কে.এন, মহাজন সুচেতা, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম", ১৮৫৭-১৯৪৭, কে.পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৪।
- সরকার, সুমিত; "আধুনিক ভারত", ১৮৮৫-১৯৪৭, কে.পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ২০১৩।
- বন্দোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, ওরিয়ন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৬।
- রায়, সিদ্ধার্থ গুহ, চট্টোপাধ্যায় সুরঞ্জন, "আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগেশিভ পাবলিশার্স, ২০১৯।
- কবিরাজ, নরহরি, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কোলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রাইভেট লিমিটেড - ১৯৫৪, কোলকাতা।
- Bose, N, S, The Indian National Movement; An Outline, 1974.

———